সীরাতে রসূলের পয়গাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সীরাতে রসূলের পয়গাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

সীরাতে রসূলের পয়গাম
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম

শ.প্র. : ৭৩
ISBN : 978-984-645-071-2

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ১৯৯৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৩ ঈসায়ী

কম্পোজ : মুরতোজা হাসান খালেদ
Saamra Computer

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ২৫.০০ টাকা মাত্র

Seerat-e-Rasuler Paigam by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Translated by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8317410, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. 1st Print: August 1996, 2nd Print: August 2013.
Price Tk. 25.00 Only

আমাদের কথা

মহানবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে সত্য দীন ও পথনির্দেশ নিয়ে এসেছেন। তাঁর আনীত হিদায়াতের অনুসরণই মানবজাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায়। নাজাতের জন্যে তাঁর সীরাতই একমাত্র অনুকরণীয়। হিদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভের জন্যে মানবজাতিকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তাঁকেই পথপ্রদর্শক ও আদর্শ নেতা মেনে নেয়া উচিত।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর এ পুস্তিকাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের উপর একটি চমৎকার পুস্তিকা। এটি তাঁর দুটি ভাষণের সংকলন।

আশা করি পাঠকগণ এ পুস্তিকাটি থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের উপর একটি মৌলিক ধারণা লাভ করবেন। আর তাতেই রয়েছে এটি প্রকাশের সার্থকতা।

আবদুস শহীদ নাসিম

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

সীরাতে রসূলের পয়গাম*

জনাব ভাইস চ্যান্সেলর, ছাত্র সংসদের সভাপতি ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ!

আজকের এই সমাবেশে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের মূল আহবান সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, শুধু একজন নবীর সীরাতের পয়গাম কেন? অন্য কারো পয়গাম কেন নয়? শুধুমাত্র সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের পয়গাম কেন? অন্যান্য নবী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সীরাতের পয়গাম নয় কেন? এ প্রশ্নের উপর প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অন্য কোনো পথ প্রদর্শকের জীবন চরিতে নয়, বরং শুধুমাত্র একজন নবীর জীবন চরিতেই আমরা হিদায়াত বা পথের সন্ধান পেতে পারি। অন্য কোনো নবী অথবা ধর্মীয় নেতার জীবনে নয়, বরং কেবল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিতেই আমরা সে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত লাভ করতে পারি, যার আমরা আসলেই মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিদায়াতের প্রয়োজনীয়তা

এ কথা মহাসত্য যে, আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তিনিই এ বিশ্বজগত ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কার থাকতে পারে? স্রষ্টাই তো জানতে পারেন তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য। সৃষ্টি তো কেবল ততোটুকুই জানতে পারে যতোটুকু স্রষ্টা তাকে জানাবেন। সৃষ্টির তো নিজস্ব কোনো মাধ্যম নেই, যার দ্বারা সে প্রকৃত সত্য জানতে পারে।

---

* ১৯৭৫ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ মাওলানাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাষণ দানের আমন্ত্রণ জানায়। এটি 'সীরাতে রসূলের পয়গাম' শিরোনামে প্রদত্ত মাওলানার সেই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। -অনুবাদক।

দু'টি জিনিসের পরখ ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, যাতে করে আলোচনায় কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। একটি হলো, এমন কিছু তত্ত্বজ্ঞান আছে যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনারা লাভ করতে পারেন এবং তার থেকে চিন্তা, গবেষণা, যুক্তি, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন। এসব ব্যাপারে উর্ধ্ব জগত থেকে কোনো জ্ঞান লাভের প্রয়োজন পড়েনা। এগুলো আপনাদের নিজস্ব অনুসন্ধান, চিন্তা-গবেষণা, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের কাজ। এ দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের চার পাশে যা কিছু আছে, তা অনুসন্ধান করে বের করুন। তাতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করুন। তাতে যে প্রাকৃতিক বিধি-বিধান কার্যকর রয়েছে তা উপলব্ধি করুন। তারপর উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের স্রষ্টা আপনাদেরকে একাকী ছেড়ে দেননি। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অবচেতন উপায়ে পর্যায়ক্রমে তাঁর সৃষ্ট জগতের সাথে আপনাদের পরিচয় করাতে থাকেন। নতুন নতুন তথ্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ইলহামের পদ্ধতিতে কোনো কোনো মানুষকে এমন ইংগিত দান করতে থাকেন যে, সে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে অথবা নতুন কোনো নীতি পদ্ধতি জানতে পারে। তথাপি এসব কিছু মানুষের জ্ঞানেরই আওতাভুক্ত। এর জন্যে কোনো নবী কিংবা কোনো আসমানি কিতাবের প্রয়োজন হয়না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করার উপায় উপাদানও মানুষকে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে। তা আমাদের একেবারে নাগালের বাইরে। তা আমরা না পরিমাপ করতে পারি, আর না আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে তা আমরা জানতে পারি। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা সে সম্পর্কে কোনো অভিমত পেশ করলে তা নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে করেন। সেটাকে জ্ঞান বলা যেতে পারেনা। সেটা হচ্ছে তাদের মত বা মতবাদ। যাঁরা মতবাদ পেশ করেছেন স্বয়ং তাঁরাও মতবাদকে নিশ্চিত বলে ঘোষণা করতে পারেননা। যদি স্বীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজেরাও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননা এবং অন্য কাউকে তা বিশ্বাস করার কথা বলতেই পারেননা।

নবীর প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা

এখন এই দ্বিতীয় বিষয়ে কোনো জ্ঞান লাভ হলে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই হতে পারে। কারণ সকল তত্ত্ব ও তথ্য কেবল তাঁরই জানা আছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে জিনিসের মাধ্যমে এ জ্ঞান দান করেন তা হলো 'অহি'। এ অহি নবীগণের উপর নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা আজ পর্যন্ত কখনো এমনটি করেননি যে, একটি কিতাব মুদ্রিত করে প্রত্যেক মানুষের হাতে তার কপি দিয়ে দিয়েছেন আর একথা বলে দিয়েছেন যে, 'তোমার এবং বিশ্ব প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব কি তা এ কিতাবখানা পড়ে জেনে নাও এবং সে তত্ত্ব অনুযায়ী দুনিয়ায় তোমার কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত তাও জেনে নাও। বরং এ জ্ঞান মানুষ পর্যন্ত পৌছাবার জন্যে তিনি নবীগণকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে করে তাঁরা এ জ্ঞান কেবল শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত না হন, বরঞ্চ মানুষকে তা বুঝিয়ে দেন, সে অনুযায়ী নিজে কাজ করে তাদের দেখিয়ে দেন, তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করেন এবং এ জ্ঞান যারা গ্রহণ করে তাদেরকে এমনভাবে সংগঠিত ও সমাজবদ্ধ করে দেন, যাতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে জ্ঞানেরই আলো বিচ্ছুরিত হয়।

আশা করি এখন এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পথ নির্দেশনার জন্যে আমরা কেবল একজন নবীর সীরাতেরই মুখাপেক্ষী। কোনো অনবী যদি নবীর অনুসারী না হয়, তাহলে যতো বড়ো মহাপন্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারেনা। কারণ তার কাছে সত্য জ্ঞান নেই। সত্য জ্ঞানের সে অধিকারীও নয়। সে আমাদেরকে কোনো সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা দিতেও পারেনা, দেখাতেও পারেনা।

মুহাম্মদ সা. ছাড়া অন্য কোনো নবীর আনুগত্য না করার কারণ

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা যাঁদের নবী বলে জানি এবং যেসব ধর্মনেতা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাঁরাও হয়তো নবী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকেই আমরা কেন হিদায়াত লাভের চেষ্টা করি? এটা কি কোনো গোঁড়ামি, নাকি এর পেছনে কোনো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে?

আসলে এর পেছনে রয়েছে অত্যন্ত ন্যায়সংগত কারণ। কুরআনে যেসব নবীর নাম উল্লেখ আছে, তাঁদের যদিও আমরা নিশ্চিতরূপে নবী বলে জানি এবং মানি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো শিক্ষা ও জীবন চরিতই

কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারিনা। হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, নিঃসন্দেহে নবী ছিলেন। তাঁদের সকলের প্রতিই আমরা ঈমান রাখি। কিন্তু তাঁদের প্রতি নাযিল হওয়া কোনো কিতাব সুরক্ষিত আকারে হুবহু আজ বর্তমান নেই যে, তার থেকে আমরা হিদায়াত গ্রহণ করতে পারি। তাঁদের কারো জীবন চরিত সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে আমাদের কাছে পৌঁছেনি যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবো। এই নবীগণের শিক্ষা ও জীবন চরিত সম্পর্কে কেউ কিছু লিখতে চাইলে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশি লিখতে পারবেনা। যতোটুকু পারবে তাও কুরআনের সাহায্যে। কারণ কুরআন ছাড়া তাঁদের সম্পর্কে জানার আর কোনো প্রমাণ্য উপকরণ বর্তমান নেই।

ইহুদিদের গ্রন্থাবলি ও নবীগণের অবস্থা

মূসা আলাইহিস সালাম, তাঁর পরবর্তী নবীগণ ও তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সেসব বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে। কিন্তু ইতিহাসের আলোকে বাইবেলের পর্যালোচনা করে দেখুন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইতুল মাকদাসের ধ্বংসের সময় তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই সাথে ঐসব নবীগণের সহীফাগুলোও বিনষ্ট হয়ে যায়, যাঁরা সে যুগের পূর্বে অতীত হয়েছেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যখন ইসরাঈলিগণ বেবিলনের বন্দি দশা থেকে মুক্তিলাভ করে, তখন হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম অন্যান্য বুযুর্গানের সাহায্যে মূসা আলাইহিস সালামের সীরাত এবং বনি ইসরাইলের ইতিহাস সংকলন করেন। তাতেই ওসব আয়াত সুযোগ মতো সন্নিবেশিত করেন, যেগুলো তাঁর ও তাঁর সাহায্যকারীদের হস্তগত হয়েছিল। তারপর খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন লোক [জানিনা তারা কারা] ঐসব নবীর সহিফা সংকলন করে, যাঁরা তাদের কয়েক শতাব্দী পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন। জানিনা কোন্ সূত্রে তারা এসব করেছে। যেমন ধরুন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তিনশত বছর পূর্বে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নামে কোনো এক ব্যক্তি একখানা বই লিখে বাইবেলের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেন। অথচ তিনি খৃষ্টপূর্ব অষ্টম

শতাব্দীতে নবী ছিলেন। যবুর (Psalms) হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পাঁচশ' বছর পরে লেখা হয় এবং তার মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছাড়াও অন্যান্য একশ' কবির শ্লোক সন্নিবেশিত করা হয়। জানিনা কোন্ সূত্রে যবুর প্রণয়নকারীদের কাছে এসব তথ্য পৌঁছেছে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নয়শ' তেত্রিশ বছর আগে। অথচ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রবাদগুলো লিখিত হয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দুইশ' পঞ্চাশ বছর পূর্বে। তার মধ্যে আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির কথাও সংকলন করা হয়েছে।

আসলে বাইবেলের কোনো একটি পুস্তকের সূত্রও ঐসব নবী পর্যন্ত পৌঁছেনা যাদের প্রতি সেগুলো আরোপ করা হয়। তাছাড়া ইবরানি ভাষায় লিখিত বাইবেলের এসব গ্রন্থও সত্তর খৃষ্টাব্দে বাইতুল মাকদাস দ্বিতীয়বার ধ্বংস হবার সময় বিনষ্ট হয়ে যায়। ওগুলোর কেবল গ্রীক অনুবাদই অবশিষ্ট ছিলো। এ অনুবাদ করা হয়েছিল দুইশ' আটান্ন খৃষ্টপূর্ব থেকে প্রথম শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে ইহুদি পন্ডিতগণ ঐসব পান্ডুলিপি থেকে ইবরানি বাইবেল প্রণয়ন করেন, যেগুলো রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। এখন এর প্রাচীনতম যে বইখানি পাওয়া যায় তা নয়শ' ষোল খৃষ্টাব্দের লেখা। এছাড়া অন্য কোনো ইবরানি বাইবেল বর্তমান নেই। লূত সাগরের (Dead Sea) সন্নিকট গারে কামরানে যেসব ইবরানি ফালি (Scrolls) পাওয়া যায়, সেগুলো বড়জোর খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর লেখা। তাতে বাইবেলের শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশই পাওয়া যায়। বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকের যে সংকলন সামেরীয়দের (Samaritan) কাছে প্রচলিত, তার প্রাচীনতম পুস্তক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লেখা। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে গ্রীক অনুবাদ করা হয় তাতে ছিলো অসংখ্য ভুলত্রুটি। তা থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করা হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের অবস্থা ও শিক্ষা সম্পর্কে এসব উপাদান উপকরণকে কিসের ভিত্তিতে প্রামান্য (Authentic) বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?

এছাড়া ইহুদিদের মধ্যে লোক পরম্পরায় কিছু মৌখিক বর্ণনা ও কিংবদন্তী পাওয়া যায়, যাকে মৌখিক আইন (Oral Law) বলা হয়। তের চৌদ্দশ' বছর পর্যন্ত এগুলো অলিখিত ছিলো। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে এবং

তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে রিব্বি ইয়াহুদা বিন শামউন সেগুলোকে মিশ্না (Mishnah) নামে লিখিত রূপ দান করেন। ফিলিস্তিনের ইহুদি পন্ডিতগণ 'হালাকা' নামে এবং বেবিলনের পন্ডিতগণ 'হাগ্‌গাদা' নামে সেগুলোর ভাষ্য লেখেন খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে। এ তিনটি গ্রন্থের সমষ্টিকে বলা হয় তালমূদ। এসবের কোনো বর্ণনারই কোনো সূত্র উল্লেখ নেই, যাতে করে জানা যেতে পারে যে, এগুলো কাদের দ্বারা বর্ণিত হয়ে কাদের কাছে পৌঁছেছে।

ঈসা আ. ও খৃষ্ট ধর্মের পুস্তকসমূহের অবস্থা

ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন চরিত ও শিক্ষার অবস্থা অনেকটা এরকমই। যে মূল ইঞ্জিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল, তা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম লোকদের মৌখিকভাবে শুনিয়ে দেন। তাঁর অনুসারীরা তা অন্যদের কাছে এমনভাবে মুখে মুখে পৌঁছিয়ে দিতেন যে, নবীর অবস্থা এবং ইঞ্জিলের আয়াতগুলো একাকার হয়ে যেতো। তার কোনো কিছুই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় অথবা তাঁর পরে লিখিত হয়নি। লেখার কাজ করেন ঐসব খৃষ্টানগণ যাদের ভাষা ছিলো গ্রীক। অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা ছিলো সুরিয়ানি (Syriac) অথবা আরামি (Aramaic)। তাঁর শিষ্যগণও এ ভাষাতেই কথা বলতেন। গ্রীক ভাষাভাষী অনেক গ্রন্থকার এ বর্ণনাগুলো আরামি ভাষায় শুনেন এবং তা গ্রীক ভাষায় লেখেন। এসব গ্রন্থকারের লিখিত কোনো গ্রন্থই সত্তর খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয়নি। তাদের কেউই কোনো ঘটনা এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনো বাণীর সূত্র বর্ণনা করেননি। ফলে একথা জানা যায়না যে, তাঁরা কোন্ কথাগুলো কার কাছ থেকে শুনেছেন। তাছাড়া তাঁদের লিখিত মূল গ্রন্থগুলোও সংরক্ষিত নেই। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের হাজার হাজার গ্রীক ভাষার বই একত্র করা হয়, কিন্তু তার কোনো একটিও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। বরং এগুলোর অধিকাংশই খৃষ্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর। মিসরে প্যাপিরাসের উপর লিখিত কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া গেছে। সেগুলোরও কোনোটাই তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় কে কখন এবং কোথায় অনুবাদ করেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়না। চতুর্থ শতাব্দীতে পোপের নির্দেশে এসব পুনঃপরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়। এরপর ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ওসব পরিত্যাগ করে গ্রীক ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় এক নতুন অনুবাদ করা হয়। গ্রীক থেকে সুরিয়ানি ভাষায় চারটি ইঞ্জিলের অনুবাদ সম্ভবত

দুইশ' খৃষ্টাব্দে করা হয়। কিন্তু এর চেয়েও প্রাচীনতম যে গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় তা চতুর্থ শতাব্দীর লেখা। পঞ্চম শতাব্দীর কলমে লেখা যে বইটি পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট ভিন্ন ধরণের। সুরিয়ানি থেকে আরবি ভাষায় যে অনুবাদ করা হয়েছে তার মধ্যেও কোনোটি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। মজার ব্যাপার হলো, প্রায় সত্তরটি ইঞ্জিলগ্রন্থ লেখা হয়, কিন্তু খৃষ্ট ধর্মীয় নেতাগণ মাত্র চারটি অনুমোদন করেন আর অবশিষ্টগুলোকে নাকচ করে দেন। জানিনা অনুমোদন বা কিসের ভিত্তিতে করা হলো আর নাকচই বা কিসের ভিত্তিতে করা হলো? এ ধরণের উপকরণের ভিত্তিতে লিখিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন চরিত ও তাঁর শিক্ষা দীক্ষা কি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়?

যরদশ্‌তের জীবন চরিত ও শিক্ষার অবস্থা

অন্যান্য ধর্মনেতাগণের অবস্থাও ভিন্ন রকম নয়। যেমন ধরুন যরদশ্‌ত (Zoroaster)। এখন পর্যন্ত তাঁর সঠিক জন্মকাল জানা যায়নি। বড়োজোর একথা বলা যেতে পারে যে, আলেকজান্ডারের ইরান বিজয়ের আড়াইশ' বছর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাড়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে। তাঁর গ্রন্থ আবেস্তা মূল ভাষায় এখন আর বর্তমান নেই। সে ভাষাটিও এখন মৃত, যে ভাষায় তা লিখিত ছিলো অথবা মৌখিক বর্ণনা করা হয়েছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তার কিছু অংশের অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ নয় খন্ডে করা হয়েছিল।

তার মধ্যে প্রথম দুখন্ড বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এখন তার যে প্রাচীনতম খন্ডটি পাওয়া যায় তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লেখা। এ হলো যরদশ্‌তের উপস্থাপিত গ্রন্থের অবস্থা। আর যরদশ্‌তের জীবন চরিতের বিষয় তো এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়না যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। দু বছর পর বাদশাহ্ গুশ্‌তাস্‌প্ তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধর্ম সরকারি ধর্মে পরিণত হয়। সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যতোই সময় অতিবাহিত হতে থাকে ততোই তাঁর সম্পর্কে নানান ধরণের আজগুবি কল্পকাহিনী রচিত হতে থাকে। তাঁর সম্পর্কে রচিত কোনো কিছুই প্রামাণ্য নয়। এর কোনো কিছুকেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দেয়া যায়না।

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা

বিশ্বের খ্যাতিমান ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ একজন। যরদশ্‌তের মতোই তাঁর সম্পর্কেও এ অনুমান করা যায় যে, হয়তো বা তিনিও নবী

ছিলেন। কিন্তু তিনি মোটেই কোনো কিতাব পেশ করেননি। তাঁর অনুসারীগণও এমন কোনো দাবি করেননি যে, তিনি কোনো কিতাব এনেছেন। তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পর তাঁর বাণী ও জীবন চরিত একত্র করার কাজ শুরু করা হয়। একাজ কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। কিন্তু এ ধরণের যেসব গ্রন্থকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল গ্রন্থ বলে মনে করা হয় সেগুলোর কোনোটির মধ্যেই কোনো সূত্র সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে গৌতম বুদ্ধের জীবন চরিত, বাণী ও শিক্ষা যাঁরা সংকলন করেছেন, কোন্ সূত্রে সেগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়না।

কেবল মুহাম্মদ সা.-এর সীরাত ও শিক্ষাই সুরক্ষিত আছে

এযাবতকার আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো, অন্যান্য নবী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষা ও জীবন চরিত কোনো প্রামাণ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেনি এবং তাদের থেকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সাথে কোনো পথ নির্দেশনা আমরা পেতে পারিনা। তাই, আমরা এমন একজন নবীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য, যিনি নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার বিকৃতি ও মিশ্রণের উর্ধ্বে একটি গ্রন্থ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। যাঁর বিস্তারিত জীবন চরিত, বাণী ও শিক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যা থেকে আমরা হিদায়াত পেতে পারি। এখন বিশ্ব ইতিহাসে এমন ব্যক্তি কেবল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আছেন, আর কেউ নন।

কুরআন নিরংকুশভাবে সুরক্ষিত আল্লাহ্র কিতাব

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট দাবি সহকারে একটি গ্রন্থ পেশ করে বলেছেন যে, এটি আল্লাহ তায়ালার বাণী। এটি তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। এ গ্রন্থের পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিতরূপে অনুভব করি যে, এতে কোনো প্রকার সংমিশ্রণ ঘটেনি। স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথাও এর সাথে সন্নিবেশিত করা হয়নি। তাঁর বাণীগুলো সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়েছে। বাইবেলের মতো তাঁর জীবন চরিত আরবের ইতিহাস ও কুরআন নাযিলকালে উদ্ভুত ঘটনাবলি আল্লাহ তায়ালার এ কালামের সাথে মিশ্রিত ও সংযোজিত করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ অবিকৃত ও বিশুদ্ধ আল্লাহ্র কালাম (Word of Allah)। এর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো একটি শব্দও সন্নিবেশিত করা হয়নি। এর শব্দাবলির মধ্যে কোনো একটি শব্দও বাদ পড়েনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত এটি অবিকল একই রকম আছে।

যখন থেকে এ কিতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হতে শুরু করে, তখন থেকেই তিনি একে লেখাতে শুরু করেন। যখনই কোনো অহি নাযিল হতো, তক্ষুনি তিনি কোনো না কোনো লেখককে ডেকে নিতেন এবং তা লিখিয়ে নিতেন। লেখার পর তা আবার তাঁকে শুনানো হতো এবং যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে, লেখক সঠিকভাবে তা লিখেছে, তখন তিনি তা একটা নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতেন। অবতীর্ণ প্রতিটি অহি সম্পর্কে তিনি লেখককে বলে দিতেন- তা কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পূর্বে কিংবা পরে সংযোজন করতে হবে। এভাবে তিনি কুরআনকে ক্রমিক পর্যায়ে সাজাতে থাকেন। অবশেষে কুরআন অবিকল পরিপূর্ণতা লাভ করে।

নামায সম্পর্কে ইসলামের সূচনা থেকেই এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তার মধ্যে কুরআন পাঠ করতে হবে। এ জন্যে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম কুরআন নাযিল হবার সাথে সাথে তা মুখস্ত করতে থাকেন। অনেকে গোটা কুরআন মুখস্ত করেন। অনেক লোক এর বিভিন্ন অংশ কম বেশি তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখেন। এছাড়া সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা লিখতে ও পড়তে পারতেন তাঁরা কুরআনের বিভিন্ন অংশ নিজেরা লিখে নিতেন। এভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই কুরআন চারটি পদ্ধতিতে সুরক্ষিত হয়ে যায়ঃ

১. তিনি স্বয়ং অহি লেখকদের মাধ্যমে তা আগাগোড়া লিখিয়ে নেন।
২. বহু সাহাবী গোটা কুরআন প্রতিটি শব্দসহ মুখস্ত করে নেন।
৩. সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেননা যিনি কুরআনের কিছু না কিছু অংশ, অল্প কিংবা বেশি, মুখস্ত করেননি।
৪. বহুসংখ্যক শিক্ষিত সাহাবী নিজ প্রচেষ্টায় কুরআন লিখে নেন এবং তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনিয়ে তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

তাই একথা অনস্বীকার্য এক ঐতিহাসিক মহাসত্য যে, আমাদের কাছে আজ যে কুরআন রয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে অবিকল সেই জিনিস , যা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে পেশ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুরআনের সকল হাফেয এবং লিখিত অংশগুলোকে একত্র করেন এবং গ্রন্থের আকারে পরিপূর্ণ কুরআন

লিখিয়ে নেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যুগে সেটারই প্রতিলিপি সরকারিভাবে ইসলামি বিশ্বের কেন্দ্রীয় স্থানগুলোতে পাঠানো হয়। এর দুটি প্রতিলিপি এখনও বর্তমান আছে। একটি ইস্তাম্বুলে এবং অপরটি তাশখন্দে। কেউ ইচ্ছা করলে কুরআন মজীদের যে কোনো একখানি মুদ্রিত কপি নিয়ে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহে কোনো পার্থক্যই তিনি দেখতে পাবেননা। আর পার্থক্যই বা হবে কি করে, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বংশানুক্রমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাফেয এ মহাগ্রন্থকে মুখস্ত করেছেন। একটি শব্দও কেউ পরিবর্তন করলে এসব হাফেয সে ভুল ধরে ফেলবেন।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইন্‌ষ্টিটিউট ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রত্যেক যুগের লিখিত কুরআন মজীদের হাতে লেখা এবং ছাপানো বিয়াল্লিশ হাজার কুরআন একত্র করে। পঞ্চাশ বছর ধরে তার উপর গবেষণা করা হয়। অবশেষে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়, তাতে বলা হয়েছে, এসব গ্রন্থে লেখার ক্রটি ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্যই নেই। এসব ছিলো প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে চতুর্দশ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের কুরআন মজীদ। এগুলো তারা সংগ্রহ করেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির উপর বোমা বর্ষণের ফলে ইন্‌ষ্টিটিউটটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে তার গবেষণার ফল বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হয়নি।

কুরআন সম্পর্কে আরেকটি কথা হলো, যে (আরবি) ভাষায় এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তা একটি জীবন্ত ভাষা। ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ আরবিকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে আর অনারব বিশ্বেও কোটি কোটি মানুষ তা পড়ে এবং পড়ায়। আরবি ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, তার শব্দের উচ্চারণ এবং বাগ্‌ধারা বিগত চৌদ্দশ' বছর আগে যেমন ছিলো আজো ঠিক তেমনি আছে। আজও যে কোনো আরবি শিক্ষিত লোক তা পড়ে ঠিক তেমনি বুঝতে পারে, যেমন বুঝতে পারতো চৌদ্দশ' বছর আগেকার আরবরা।

এটা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছাড়া আর কোনো নবী বা ধর্মনেতার নেই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে তাঁর প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছিল, তা তার মূল ভাষায় এবং মূল শব্দাবলিসহ অক্ষরে অক্ষরে অপরিবর্তিত অবস্থায় অবিকল বর্তমান আছে।

রসূলুল্লাহ্‌র সীরাত ও সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা

অন্যান্য নবী ও ধর্মীয় নেতাদের তুলনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের মতো তাঁর সীরাতও সুরক্ষিত আছে। তা থেকে আমরা জীবনের প্রতিটি বিভাগে পথনির্দেশনা লাভ করতে পারি। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতো লোক তাঁকে দেখেছে, তাঁর জীবনের অবস্থা ও কাজকর্ম দেখেছে, তাঁর বাণী শুনেছে, তাঁর ভাষণ শুনেছে, তাঁকে কোনো কিছু আদেশ করতে অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করতে শুনেছে, তাদের বিরাট সংখ্যক লোক সবকিছু হৃদয়ে গেঁথে রাখেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেন। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এমন লোকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, যাঁরা চোখে দেখা এবং কানে শোনা ঘটনাগুলোর বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কিছু হুকুম আহকাম লিখিয়ে নিয়ে কোনো কোনো লোককে দিয়েছেন বা তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যা পরবর্তী যুগের লোকেরা পেয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্তত ছ'জন সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা হাদিস লিপিবদ্ধ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে করে তাতে কোনো ভুল না থাকে। এসব লিখিত তথ্যাবলি পরবর্তী কালের লোকেরা লাভ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর অন্তত পঞ্চাশজন সাহাবী তাঁর জীবন চরিত, কার্যক্রম ও তাঁর বাণী লিখিত আকারে একত্র করেন। এসব জ্ঞানভান্ডার তাঁদেরও হস্তগত হয় পরবর্তীতে যাঁরা হাদিস সংকলনের কাজ করেন।

যেসব সাহাবী সীরাত সম্পর্কিত তথ্যাবলি মৌখিক বর্ণনা করেন তাদের সংখ্যা আমি একটু আগেই বলেছি, প্রায় এক লক্ষ। আর এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপারও নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্ব পালন করেন, তখন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এতো বিরাট সংখ্যক লোক তাঁকে হজ্ব করতে দেখেছেন, তাঁর নিকট থেকে হাজারো নিয়ম পদ্ধতি শিখেছেন এবং এ হজ্বের সময় যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তা তাঁরা শুনেছেন। এতো লোক যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ হজ্বে নবীর সাথে শরিক হবার পর নিজেদের এলাকায় ফিরে যান, তখন তাঁদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবেশীগণ তাঁদের নিকট থেকে এ হজ্জের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেননি এবং হজ্বের নিয়ম পদ্ধতি জেনে নেননি, এমনটি তো হতে পারেনা? এ থেকেই অনুমান করে

দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহান ব্যক্তির দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর মানুষ কতো আগ্রহের সাথে তাঁর জীবন চরিত, কাজ কর্ম, তাঁর কথা, নির্দেশ ও হিদায়াত সম্পর্কে ঐসব লোকের কাছে জানতে চেয়েছিল, যাঁরা তাঁকে সচোক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর নির্দেশাবলি নিজেদের কানে শুনেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে যেসব বর্ণনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলো সম্পর্কে প্রথম থেকেই একটি বিশেষ নীতি অবলম্বন করা হয়। তাহলো, যে ব্যক্তিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরোপ করে কোনো কথা বলতেন তাকে একথা বলতে হতো যে তিনি সে কথা কার কাছে শুনেছেন এবং তার আগে ধারাবাহিকতার সাথে কে কার কাছ থেকে শুনেছেন? এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরার গোটা সূত্র (link) লক্ষ্য করা হতো, যেনো এ নিশ্চয়তা লাভ করা যায় যে, কথাটি সঠিকভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে কিনা? যদি বর্ণনা অবিচ্ছিন্ন পাওয়া না যেতো, তাহলে তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতো। আবার যেটির বর্ণনা পরম্পরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু মাঝখানের কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) অনাস্থাভাজন হয়েছে, তবে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এবার একটু চিন্তা করে দেখলে আপনি অনুভব করবেন যে, পৃথিবীর কোনো মানুষের জীবনবৃত্তান্তই এভাবে সংকলিত হয়নি। এ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা বিনা সূত্রে মেনে নেয়া হয়নি। আর সূত্র শুধু এতোটুকুই দেখা হয়নি যে, একটি হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা নবী পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা? বরং এটাও দেখা হয়েছে যে, এর সকল রাবী (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য কি না? এ উদ্দেশ্যে রাবীগণের জীবনবৃত্তান্তও পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা হয়েছে এবং এ বিষয়ের উপরে বিস্তারিত গ্রন্থও প্রণয়ন করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, কে নির্ভরযোগ্য ছিলো আর কে ছিলনা? কার চরিত্র ও ভূমিকা কি রকম ছিলো? কার স্মরণ শক্তি প্রখর ছিলো আর কার ছিলনা? কে ঐ ব্যক্তির সাথে দেখা করেছে যার থেকে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে আর কে তার সাথে সাক্ষাত না করেই তাঁর নামে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছে? এভাবে এতো ব্যাপক আকারে রাবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যে, আজও আমরা প্রতিটি হাদিস যাচাই করতে পারি যে, তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, না কি অনির্ভরযোগ্য সূত্রে?

মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এমন পাওয়া যেতে পারে কি যাঁর জীবন বৃত্তান্ত এমন নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে যে, এক ব্যক্তির জীবন চরিতের সত্যতা নির্ণয়ের জন্যে হাজার হাজার লোকের জীবনের উপর গ্রন্থাদি প্রণীত হয়েছে যাঁরা ঐ এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করেছেন? বর্তমান যুগে খৃষ্টান ও ইহুদি পন্ডিতরা হাদিসের সত্যতা সন্ধিগ্ধ প্রতিপন্ন করার জন্যে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার প্রকৃত কারণ এ বিদ্বেষ ছাড়া আর কি হতে পারে যে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় গুরুদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে মোটেই কোনো সূত্র বিদ্যমান নেই? তাদের মনের এ জ্বালার কারণেই তারা ইসলাম, কুরআন ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা (Intellectual honesty) পরিহার করেছেন।

নবী মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের প্রতিটি দিক ছিলো উজ্জ্বল সুস্পষ্ট

রসূলে পাকের সীরাতের এই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই কেবল আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। বরং এটাও তাঁর এক অন্যন্য বৈশিষ্ট্য যে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকের যতো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে ততোটা পাওয়া যায়না। তাঁর পরিবার কেমন ছিলো, নবূয়্যত পূর্ব জীবন তাঁর কেমন ছিলো, কিভাবে তিনি নবূয়্যত প্রাপ্ত হলেন, কিভাবে তাঁর প্রতি অহি নাযিল হতো, কিভাবে তিনি ইসলামি দাওয়াত ছড়ালেন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা কিভাবে করলেন, আপন সংগি সাথিদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন, আপন পরিবারের সাথে কিভাবে জীবন যাপন করতেন, বিবি বাচ্চাদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিলো, বন্ধু ও শত্রুর প্রতি তাঁর ব্যবহার কেমন ছিলো, কোন্ নৈতিকতার শিক্ষা তিনি দিতেন আর আপন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি কোন্ জিনিসের শিক্ষা দিতেন, কোন্ কাজ করতে তিনি নিষেধ করতেন, কোন্ কাজ হতে দেখে তা নিষেধ করেননি, কোন্ কাজ হতে দেখে তা নিষেধ করেছেন? -এসব কিছু পুংখানুপুংখরূপে হাদিস ও সীরাতের গ্রন্থগুলোতে বর্তমান রয়েছে।

তিনি একজন সামরিক জেনারেলও ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে যতো যুদ্ধ হয়েছে তার বিশদ বিবরণ বর্তমান রয়েছে। তিনি একজন শাসকও ছিলেন। তাঁর শাসনের যাবতীয় বিবরণ আমরা অনায়েসে জানতে পারি। তিনি একজন বিচারকও ছিলেন। তাঁর সামনে উপস্থাপিত সকল মামলা মোকাদ্দমার পূর্ণ কার্যবিবরণী আমরা দেখতে পাই। আমরা এটাও জানতে পারি যে, কোন্ মামলায় তিনি কি রায় দিয়েছিলেন? তিনি বাজার পরিদর্শনেও বেরুতেন এবং

দেখতেন মানুষ কেনা বেচার কাজ কিভাবে করতো। ভুল কাজ দেখলে তা করতে নিষেধ করতেন আর যে কাজ সঠিকভাবে হতে দেখতেন তা অনুমোদন করতেন। মোটকথা, জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত পথনির্দেশ দান করে যাননি।

সেজন্যেই আমরা পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সকল নবী ও ধর্মগুরুদের মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাই সেই অনন্য সত্তা, হিদায়াত ও পথনির্দেশনার জন্যে সমগ্র মানবজাতি কেবল যাঁর শরণাপন্ন হতে পরে। কারণ তাঁর উপস্থাপিত কিতাব তার মূল শব্দাবলিসহ সুরক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া তাঁর সীরাতের বিশদ বিবরণও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যা পথনির্দেশ লাভের জন্যে একান্ত আবশ্যক।

আসুন এবার আমরা দেখি, তাঁর সীরাত পাক আমাদেরকে কি পয়গাম এবং কি পথনির্দেশ দান করছে?

মুহাম্মদ সা. এর পয়গাম সমগ্র মানবজাতির জন্যে

প্রথমেই তাঁর পয়গামের যে জিনিসটি আমাদের চোখে পড়ে তাহলো, তিনি বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভূখন্ডের স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করে মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্বোধন করেন। এমন কিছু মূলনীতি পেশ করেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্যে সমভাবে কল্যাণকর। এ মূলনীতিগুলো যে মেনে নেবে, সেই হবে মুসলমান। সে হবে বিশ্বজনীন উম্মাতে মুসলিমার সদস্য, তা সে কৃষ্ণাংগ হোক অথবা শ্বেতাংগ। প্রাচ্যবাসী হোক অথবা পাশ্চাত্যবাসী। আরব হোক কিংবা অনারব। যেখানেই কোনো মানুষ আছে, সে যে দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশেই পয়দা হোক না কেন, যে ভাষায় সে কথা বলুক এবং তার গায়ের রং যেমনই হোক না কেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তারই জন্যে। সে যদি তাঁর উপস্থাপিত মূলনীতি মেনে নেয়, তাহলে সমান অধিকারসহ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। কোনো উঁচু নীচু, কোনো বংশীয় বা শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য, কোনো ভাষাগত, জাতিগত ও ভৌগলিক ভেদাভেদ এ উম্মতের মধ্যে নেই। বিশ্বাসের ঐক্যের পর আর কোনো অনৈক্য এখানে নেই।

বর্ণ ও গোত্রীয় গোঁড়ামির প্রতিকার

চিন্তা করে দেখুন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে মানবজাতি কতো বড় নিয়ামত লাভ করেছে! মানুষকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস ধ্বংস করেছে, তাহলো তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই

স্বাতন্ত্র্য। কোথাও তাকে অপবিত্র ও অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ যে অধিকার ভোগ করে তা থেকে তারা বঞ্চিত। কোথাও তাকে নির্মূল করে দেয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ তারা অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় এমন সময় জন্মগ্রহণ করে যখন বহিরাগতদের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার। কোথাও তাকে ধরে দাসে পরিণত করা হলো এবং তার কাছ থেকে পশুর মতো শ্রম নেয়া হলো। কারণ সে আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার গায়ের রং ছিলো কালো। মোটকথা মানবতার জন্যে জাতি, ভূখন্ড, বংশ, বর্ণ ও ভাষার এ স্বাতন্ত্র্য প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিরাট বিপদের কারণ হয়ে আছে। এরই ভিত্তিতে হতে থাকে যুদ্ধ বিগ্রহ। এরই ভিত্তিতে এক দেশ আরেক দেশকে দখল করে বসেছে। এক জাতি আরেক জাতিকে লুণ্ঠন করেছে এবং বহু বংশকে ধ্বংস করেছে সমূলে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রোগের এমন এক প্রতিকার করেন যা ইসলামের শত্রুরাও স্বীকার করেন। তাহলো, ইসলাম বর্ণ, বংশ ও ভূখন্ডের স্বাতন্ত্র্যের সমাধানে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা আর কেউ পারেনি।

আফ্রিকার বংশোদ্ভুত আমেরিকাবাসীদের প্রখ্যাত নেতা এবং শ্বেতাংগদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাংগদের পক্ষ থেকে চরম বিদ্বেষ প্রচারের এককালীন পতাকাবাহী ম্যালকম্ এক্স ইসলাম গ্রহণের পর যখন হজ্জে গমন করেন এবং দেখেন যে, পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, সকল দিক থেকে সকল বংশ, বর্ণ, দেশ ও ভাষার লোক হজ্ব করতে আসছে; সবাই একই ধরণের ইহ্রামের পোশাক পরিধান করে আছে, সবাই একই স্বরে 'লাব্বায়িক' 'লাব্বায়িক' ধ্বনী উচ্চারণ করছে, একত্রে তাওয়াফ করছে, একই জামাতে একই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছে, তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন, বর্ণও বংশের যে সমস্যা, তার সুষ্ঠু সমাধান একমাত্র এটাই। আমরা এতোদিন যা করে আসছি, তা নয়। এ বেচারাকে তো যালিমেরা হত্যা করে। কিন্তু তাঁর প্রকাশিত আত্মচরিত এখনো বর্তমান আছে। তা থেকে আপনারা জানতে পারেন যে হজ্বের দ্বারা কতো গভীরভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হজ্ব তো ইসলামের ইবাদতগুলোর একটি মাত্র। কেউ যদি চোখ খুলে ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করেন, তবে তিনি কোথাও অংগুলি সংকেত করে একথা বলতে পারবেননা যে এ শিক্ষা কোনো বিশেষ জাতি, কোনো গোত্র, কোনো বংশ অথবা কোনো শ্রেণীর স্বার্থের সপক্ষে। গোটা দীন

তো এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে তা সমগ্র মানবজাতির জন্যে। এ দীনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, যারা তার মূলনীতি স্বীকার করে নিয়ে তার তৈরি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। সে অমুসলিমের সাথেও এমন কোনো আচরণ করেনা যা শ্বেতাংগরা কৃষ্ণাংগদের সাথে করেছে, যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের শাসনাধীন জাতির সাথে করেছে, যা কমিউনিস্ট সরকারগুলো তাদের শাসনাধীনে বসবাসকারী অকমিউনিস্টদের সাথে এমনকি আপন দলের অবাঞ্ছিত সদস্যদের সাথে করেছে।

এবার দেখা যাক, মানবতার কল্যাণের জন্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পয়গাম পেশ করেছিলেন তা কি? আর তাতে এমন কি জিনিস রয়েছে যা শুধু মানবতার কল্যাণেরই গ্যারান্টি নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে একই উম্মায় পরিণত করে দিতে পারে?

তাওহীদের ব্যাপকতম ধারণা

এ আদর্শের প্রধানতম বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একত্ব স্বীকার করে নেয়া। তা শুধু এ অর্থে নয় যে আল্লাহ আছেন এবং নিছক এ অর্থেও নয় যে আল্লাহ শুধু এক। বরং এ অর্থেও যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্তা এবং শাসক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সমগ্র সৃষ্টি জগতে আর এমন কেউ নেই যার সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে, যার আদেশ ও নিষেধ করার কোনো অধিকার আছে, যার হারাম করার কারণে কোনো জিনিস হারাম হয়ে যেতে পারে এবং যার হালাল করার কারণে কোনো জিনিস হালাল হয়ে যেতে পারে। এ অধিকার ও ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। কারণ যিনি স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু, কেবল তাঁরই এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তাঁর সৃষ্ট বান্দাদেরকে যে জিনিসের ইচ্ছা তা করতে আদেশ দিতে পারেন এবং যে জিনিসের ইচ্ছা তার থেকে নিষেধ করতে পারেন। ইসলামের দাওয়াত এটাই যে, আল্লাহ তায়ালাকে এ হিসেবে মেনে নাও। তাঁকে এভাবে মেনে নাও যে, তিনি ছাড়া আর কারো দাস আমরা নই। তাঁর আইনের বিপরীত আমাদের উপর হুকুম করার অধিকার কারো নেই। আমাদের মাথা তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে অবনত হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদের জীবন মরণ তাঁরই ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা তিনি আমাদের মৃত্যু দান করতে পারেন। যতোদিন ইচ্ছা আমাদেরকে জীবিত রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে যদি মৃত্যু আসে, তাহলে দুনিয়ায় এমন

কোনো শক্তি নেই, যে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। আর তিনি যদি জীবিত রাখতে চান, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদের ধ্বংস করতে পারেনা। আল্লাহ সম্পর্কে এটাই হলো ইসলামের ধারণা।

এ দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র অনুগত আজ্ঞাবহ। আর মানুষেরও কাজ এটাই যে, সেও আল্লাহ্‌র অনুগত আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। সে যদি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিরংকুশ আনুগত্য গ্রহণ করে, তবে তার জীবনের গোটা ব্যবস্থা বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থার পরিপন্থি হয়ে পড়বে। কথাটা এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন চলছে। এ সত্যকে কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা। এখন যদি আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুমের অধীন চলি, অথবা আপন খেয়াল খুশি মতো যেদিক ইচ্ছা সেদিক চলি, তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, আমাদের পূর্ণ জীবনের গোটা গাড়িখানি বিশ্বপ্রকৃতির গাড়ির বিপরীত দিকে চলছে। ফলে আমাদের এবং বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে চলতে থাকবে এক চিরন্তন সংঘর্ষ।

আরেক দিক থেকে চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী মানুষের জন্যে সঠিক জীবন পদ্ধতি (way of life) তো কেবল এটাই যে, সে শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে। কারণ সে সৃষ্ট এবং আল্লাহ তার স্রষ্টা। সৃষ্টজীব হবার কারণে তার স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়াও ভুল এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব আনুগত্য করাও ভুল। এদুটি পথের মধ্যে যেটিই সে অবলম্বন করবে, তা হবে সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক। আর সত্যের সাথে সংঘর্ষের অশুভ পরিণতি সংঘর্ষকারীকেই ভোগ করতে হয়, তাতে সত্যের কোনো ক্ষতি হয়না।

আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহবান

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত হলো, এ সংঘর্ষ বন্ধ করো। তোমার জীবন যাপনের বিধান ও রীতি পদ্ধতি তাই হওয়া উচিত, যা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির। তুমি আইন প্রণেতা সেজোনা, আর অন্যের জন্যেও এ অধিকার স্বীকার করোনা যে সে আল্লাহ্‌র জমিনে তাঁর বান্দাদের উপর নিজের আইন চালাবে। বিশ্বজগতের স্রষ্টার আইনই সত্যিকার আইন। অন্যসব আইন ভ্রান্ত ও বাতিল। সুতরাং কেবল আল্লাহ্‌রই আইন মেনে নাও। কেবল তাঁরই দাসত্ব করো। অন্য সকলের দাসত্ব ও আনুগত্য পরিহার করো।

রসূলের আনুগত্যের আহবান

এবার আমাদের সামনে আসছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের দ্বিতীয় দফা। তাহলো, তাঁর এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, আমি আল্লাহ তায়ালার নবী এবং মানবজাতির জন্যে তিনি তাঁর আইন ও বিধান আমারই মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আমি স্বয়ং সে আইনের অধীন। স্বয়ং আমারও এতে কোনো পরিবর্তন করার স্বাধীনতা নেই। আমি শুধু মেনে চলার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছু তৈরি করার অধিকারও আমার নেই। এ কুরআন এমন আইন যা আমার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আমার সুন্নাহ্‌ এমন আইন যা আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশে জারি করি। এ আইনের সামনে সবার আগে মস্তক অবনতকারী আমি নিজে, অতপর আমি সমস্ত মানুষকে আহবান জানাচ্ছি, তারা যেনো অন্যদের আইনের আনুগত্য পরিহার করে কেবল এ আইনের আনুগত্য করে।

আল্লাহ্‌র পর আনুগত্য লাভের অধিকারী আল্লাহ্‌র রসূল

কেউ কেউ এ সন্দেহে পড়তে পারেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কিভাবে নিজের সুন্নতের আনুগত্য করতে পারেন যখন সে সুন্নাহ হচ্ছে তাঁর নিজেরই কথা ও কাজ। আসলে কুরআন যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, ঠিক তেমনি রসূল হিসেবে তিনি যেসব হুকুম দিতেন, যা যা করতে তিনি নিষেধ করতেন অথবা যে যে রীতি পদ্ধতি নির্ধারিত করতেন তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হতো। এটাই সুন্নতে রসূল এবং এর আনুগত্য তিনি নিজেও সেভাবেই করতেন যেভাবে করা অপরিহার্য ছিলো সকল ঈমানদারের জন্যে।

একথাটি পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে যেতো তখন, যখন সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম কোনো বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একথা কি আপনি আল্লাহ্‌র হুকুমে বলছেন, না কি এটা আপনার নিজের অভিমত? তিনি জবাবে বলতেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে নয়, বরং এটা আমার নিজস্ব অভিমত। একথা জানার পর সাহাবায়ে কিরাম নবীর কথায় একমত না হয়ে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করতেন। তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অভিমত ত্যাগ করে তাঁদের প্রস্তাব মেনে নিতেন। একথা তখনো পরিষ্কার হয়ে যেতো, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। এই পরামর্শ কথাটাই একথার প্রমাণ

করে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুম হলে তো সেখানে পরামর্শের কোনো প্রশ্নই আসেনা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ ধরণের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদিসে পাই। বরং সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম তো বলেন, আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক পরামর্শ গ্রহণকারী আর কাউকে দেখিনি। একটু চিন্তা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোনো নির্দেশ নেই সে ব্যাপারে পরামর্শ করা ছিলো নবীর সুন্নত। অন্য কেউ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব অভিমতকে অপরের জন্যে শিরোধার্য বলে ঘোষণা করেননি। এভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ থাকবে তা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে চলতে হবে। আর যেখানে আল্লাহ্‌র কোনো নির্দেশ থাকবেনা, সেখানে থাকবে স্বাধীন মতামতের নির্বিঘ্ন অধিকার।

স্বাধীনতার প্রকৃত চার্টার

এ হচ্ছে মানবজাতির জন্যে স্বাধীনতার এক অনন্য চার্টার, যা একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কেউ মানবজাতিকে দান করেনি। আল্লাহ্‌র বান্দাহ শুধু আল্লাহ্‌রই দাস হবে। অন্য কারো দাস সে হবেনা। এমনকি আল্লাহ্‌র রসূলের দাসও নয়। এ চার্টার মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের বন্দিগি (দাসত্ব আনুগত্য) থেকে স্বাধীন ও মুক্ত করে দিয়েছে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছে।

একই সাথে এ পয়গাম মানুষকে দান করেছে এক মহানতম নিয়ামত। তাহলো আল্লাহ্‌র আইনের শ্রেষ্ঠত্ব, যা বাতিল করার, বিকৃত করার, কিংবা রদবদল করার অধিকার কোনো বাদশাহ, ডিক্টেটর অথবা কোনো গণতান্ত্রিক আইন সভা কিংবা ইসলাম গ্রহণকারী কোনো জাতির নেই। এ আইন মানুষকে প্রদান করে ভালো ও মন্দের এক শাশ্বত মূল্যবোধ (Permanent Values)। এর বিধান পরিবর্তন করে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহীর ধারণা

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় পয়গাম ও মহান শিক্ষা এই ছিলো যে, হে মানুষ! তোমাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী

করতে হবে। দুনিয়ায় তোমাকে লাগামহীন পশুর মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, তুমি যা খুশি তাই করবে। খুশিমতো যে কোনো ক্ষেত খামারে চরে বেড়াবে আর তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবেনা? তোমার এক একটি কথা এবং তোমার গোটা স্বেচ্ছামূলক জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের হিসেব তোমার স্রষ্টা ও প্রভুকে দিতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং তোমার প্রভুর সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে হাযির করা হবে।

এটা এমন এক বিরাট নৈতিক শক্তি, যদি তা মানুষের বিবেকের মধ্যে স্থান লাভ করে, তবে তার অবস্থা এমন হবে যেনো, তার সাথে সদাসর্বদা একজন চৌকিদার লেগে আছে, যে দুষ্কৃতির প্রতিটি প্রবণতার জন্যে তাকে সতর্ক করে দেয়। প্রত্যেক পদক্ষেপে তাকে বাধা দেয়। বাইরে কোনো পাকড়াওকারী পুলিশ এবং শাস্তিদানকারী সরকার থাকুক না থাকুক, তার ভেতরেই এমন এক ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বসে থাকবে, যার হাতে পাকড়াও হবার ভয়ে সে কখনো নিভৃতে, বন জংগলে, গভীর অন্ধকারে কিংবা কোনো জনমানবহীন স্থানেও আল্লাহ্র অবাধ্য হতে পারবেনা।

মানুষের নৈতিক সংশোধন এবং তার মধ্যে এক মজবুত চরিত্র সৃষ্টি করার জন্যে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোনো উপায় হতে পারে কি? মানুষ অন্য যে কোনো উপায়েই চরিত্র গঠনের চেষ্টা করুন না কেন এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবেনা। বরং বস্তুবাদী মানুষ তো এ নীতিই গ্রহণ করে যে, অসৎ কাজ এবং বেঈমানী যদি মংগলকর হয় এবং তাতে ক্ষতির কোনো আশংকা না থাকে, তবে বিনা দ্বিধায় তা করে ফেলা যায়। এ দৃষ্টিকোণের পরিমাণ তো এই হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে যারা সৎ আচরণের অধিকারী তারাই জাতীয় আচার আচরণে চরম পর্যায়ের বেঈমানী, প্রতারক, লুন্ঠনকারী, যালিম ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেরও কোনো কোনো ব্যাপারে তারা সৎ হলেও অন্যান্য ব্যাপারে চরম অসৎ হয়ে পড়ে। আপনারা দেখতে পাবেন, একদিকে তারা লেনদেনে সৎ এবং আচার আচরণে ভদ্র, অপরদিকে মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, জুয়াড়ী, অত্যন্ত চরিত্রহীন এবং কলুষিত ও কলংকিত। তারা বলে, মানুষের ব্যক্তি জীবন এক জিনিস আর সমাজ জীবন বা লোক জীবন (Public life) অন্য জিনিস।

তাদের ব্যক্তি জীবনের কোনো দোষ দেখিয়ে দিলে তারা ত্বরিত আপনাকে মুখের উপর বলে দেবে, আপন চাকায় তেল দাও।

এর ঠিক বিপরীত হলো আখিরাতের আকীদা বিশ্বাস। তাহলো এই যে, পাপ সব সময়েই পাপ, দুনিয়ার জীবনে তা কল্যাণকর হোক কিংবা অনিষ্টকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহীর অনুভূতি পোষণ করে তার জীবন ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি বিভাগে বিভক্ত হতে পারেনা। সে ঈমানদারি অবলম্বন করলে এজন্যে করেনা যে, এটা একটা উত্তম নীতি। বরং তার অস্তিত্বের মধ্যেই ঈমানদারি শামিল হয়ে থাকে। সে চিন্তাই করতে পারেনা যে বেঈমানি করাটা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতে পারে। তার আকীদা বিশ্বাস তাকে এই শিক্ষা দেয়, সে যদি বেঈমানি করে তবে সে পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হবে। যেমন কুরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

"নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠন-প্রকৃতিতে। তারপর তাকে আমরা পৌঁছে দিই নিচুদের চাইতেও নিচুতে।"

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মানুষ এভাবে কেবল শাশ্বত নৈতিক মূল্যবোধ সম্বলিত একটা অপরিবর্তনীয় আইনই লাভ করেনি, বরং ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের এমন একটি ভিতও লাভ করেছে, যা একেবারে অনড় ও অটল। এ আইন এমন নয় যে, কোনো সরকার, কোনো পুলিশ, কোনো আদালত থাকলেই কেবল আপনি সৎ পথে চলতে পারবেন, নতুবা চলতে হবে পাপ ও অপরাধের পথে।

বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে জাগতিক ক্রিয়াকর্মে চরিত্রের ব্যবহার

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। তাহলো, চরিত্র সংসার বিরাগীদের নিভৃত কক্ষের জন্যে নয়, দরবেশদের খানকার জন্যে নয়, বরং দুনিয়ার জীবনের সকল বিভাগে উত্তির্ণ হবার জন্যে। মানুষ ফকির দরবেশদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির তালাশ করে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রাষ্ট্রীয় মসনদে এবং বিচারালয়ের আসনে সমাসীন করে দেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহভীতি ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন। পুলিশ ও সৈনিককে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষের এ ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র অলি সেই হতে পারে, যে দুনিয়াকে বর্জন করে শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন অলিত্ব এটার নাম নয়, বরং প্রকৃত অলিত্ব হলো, মানুষ শাসক, বিচারক, সেনাধ্যক্ষ, থানার দারোগা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অন্যান্য

সকল জাগতিক ও বৈষয়িক কাজে সম্পৃক্ত থেকেও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহভীরু এবং সৎ ও বিশ্বস্ত হওয়ার প্রমাণ দেবে, যেখানে তার ঈমান হবে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। এভাবে তিনি চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতাকে বৈরাগ্যবাদের নিভৃত কোণ থেকে টেনে বের করে অর্থনীতিতে, সামাজিকতায়, রাজনীতিতে ও বিচারালয়ে এবং যুদ্ধ ও সন্ধির ময়দানে নিয়ে এসেছেন। এভাবে এসব স্থানে পূণ্যময় পবিত্র চরিত্রের শাসন কায়েম করেছেন। এসব ময়দানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকেরাই প্রকৃত অলি আল্লাহ ও দরবেশ।

নবী পাক সা.-এর পয়গামের উত্তম প্রভাব

এ ছিলো মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াতের এক বিরাট শুভ প্রভাব যে, নবুয়্যতের সূচনালগ্নে যারা ছিলো ডাকাত, তাদেরকে তিনি এমন করে রেখে গেলেন যে, তারা আমানতদার এবং মানুষের জান মাল ও ইজ্জৎ আবরুর রক্ষক হয়ে পড়লো। যাদেরকে তিনি পেয়েছিলেন পরের সম্পদ হরণকারী, তাদেরকে অধিকার প্রদানকারী, অধিকার রক্ষক এবং অপরের অধিকার প্রদানে উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে রেখে গেলেন। তাঁর পূর্বে তো পৃথিবী শুধু ঐসব শাসকদের সম্পর্কেই অবগত ছিলো, যারা যুলুম নিষ্পেষণের মাধ্যমে প্রজাদেরকে অবদমিত করে রাখতো এবং আকাশচুম্বী প্রাসাদে বসবাস করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব খাটাতো। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পৃথিবীকেই এমনসব শাসকের সাথে পরিচিত করিয়ে দিলেন, যারা হাটে বাজারে সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করতেন এবং ন্যায় নীতি ও সুবিচার দিয়ে মানুষের মন জয় করতেন।

তাঁর পূর্বে পৃথিবী তো কেবল ঐসব সৈনিককেই জানতো যারা কোনো দেশে প্রবেশ করলে চারদিকে হত্যাকান্ড চালাতো, জনপদগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতো এবং বিজিত জাতির নারীদের সম্ভ্রম সতীত্ব বিনষ্ট করতো। তিনি সেই পৃথিবীকেই আবার এমন সেনাবাহিনীর সাথে পরিচিত করে দিলেন, যারা কোনো শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে শত্রুদের সশস্ত্র লোক ছাড়া আর কারো উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না এবং বিজিত শহর থেকে আদায়কৃত কর তাদেরকেই ফেরত দিয়ে দিতেন। মানব ইতিহাস বিভিন্ন দেশ ও নগর বিজয়ের কাহিনীতে ভরপুর। কিন্তু মক্কা বিজয়ের কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবেনা। যে শহরের লোকেরা তেরো বছর যাবত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর

যুলুম নিষ্পেষণ চালিয়েছিল, সে শহরেই বিজয়ীর বেশে তিনি প্রবেশ করেন এমনভাবে যে, আল্লাহ্‌র সামনে অবনত মস্তকে তিনি চলছিলেন। তাঁর কপাল উটের হাওদা ছোঁয়া ছোঁয়া হচ্ছিল এবং তাঁর আচরণে গর্ব অহংকারের লেশমাত্র ছিলনা। ঐসব লোক, যারা তেরোটি বছর ধরে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকে, যারা তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করে এবং হিজরতের পরও তাঁর বিরুদ্ধে আটটি বছর ধরে যুদ্ধ করে, তারা পরাজিত হয়ে যখন তাঁর সামনে হাজির হয়ে করুণা ভিক্ষা করে, তখন তিনি প্রতিশোধ নেবার পরিবর্তে ঘোষণা করেনঃ "আজ তোমাদের কোনো পাক্‌ড়াও নেই। যাও, তোমরা আজ মুক্ত।"

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম ও আদর্শের যে প্রভাব মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর পড়েছে, কেউ যদি তার সঠিক ধারণা করতে চান, তবে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন, মুসলমান যখন বিজয়ীর বেশে স্পেনে প্রবেশ করে, তখন তাদের আচরণ কিরূপ ছিলো? আর খৃষ্টানরা যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়, তখন তারা কোন্ ধরণের আচরণ করেছিল? ক্রুসেড যুদ্ধকালে যখন খৃষ্টানগণ বাইতুল মাক্‌দাস প্রবেশ করে, তখন তারা মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করেছিল? আর মুসলমানরা যখন বাইতুল মাক্‌দাস খৃষ্টানদের হাত থেকে পুনরায় দখল করে তখন খৃষ্টানদের প্রতি তাঁরা কিরূপ আচরণ করেছিলেন!

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সীরাত এমন এক মহাসমুদ্রসম যা কোনো একটি গ্রন্থেও সংকুলান করা সম্ভব নয়। আর একটিমাত্র বক্তৃতায় তো তার চিন্তাও করা যায়না। তবু আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁর সীরাতের কিছু উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি আলোকপাত করলাম। ভাগ্যবান তাঁরাই, যাঁরা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতকেই জীবন চলার পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহন করবেন।

❖ ❖

বিশ্বনবীর অমর অবদান*

পৃথিবীর সব মানুষই জানে, আল্লাহ্‌র মনোনীত যে দলটি সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদাত, আনুগত্য এবং সৎ চরিত্রের শিক্ষা দেয়ার জন্যে যুগে যুগে প্রেরিত হয়ে এসেছেন, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরই একজন। এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্ব এবং পবিত্র নৈতিক জীবন যাপনের যে শিক্ষা চিরদিন নবীগণ দিয়ে এসেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কোনো অভিনব তত্ত্ব পেশ করেননি। পূর্ববর্তী নবীরা নৈতিকতার যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে নতুন কোনো চরিত্রের শিক্ষাও তিনি দেননি। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাঁর সেই আসল অবদানটা কি, যার জন্যে আমরা তাঁকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করি?

এর জবাবে বলবো, নবী মুহাম্মদের পূর্বে মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে অবশ্যই অবগত ছিলো, তবে এ দার্শনিক তত্ত্বের সাথে মানুষের চরিত্রের সম্পর্ক কি, তা তাদের জানা ছিলনা। তখন চরিত্রের উত্তম মূলনীতিগুলো মানুষ জানতো। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কিভাবে হওয়া উচিত, তা তাদের ভালো করে জানা ছিলনা। তাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, চারিত্রিক মূলনীতি ও মানুষের বাস্তব জীবন- এ তিনটি জিনিস ছিলো সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। এর একটার সাথে অন্যটার কোনো বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র, কোনো নিবিড় সম্পর্ক এবং কোনো কার্যকরী বন্ধন ছিলনা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে এ তিনটি জিনিসকে একটা একক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসেন। এ তিনটির সমন্বয়ে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সমাজ গড়ে তোলেন। সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপরেখা তিনি শুধু কল্পনার জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা বাস্তব জীবনেও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

ঈমান হলো চালিকা শক্তি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীনে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং এখানে ঈমান স্বভাবতই এক বিশেষ

---

* এটি ১৯৪৮ সালে রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত মাওলানার একটি 'বেতার কথিকা' -অনুবাদক

ধরণের চরিত্র দাবি করে। মানুষের বাস্তব জীবনের আচরণ ও চরিত্রে তার প্রতিফলন ঘটতে হবে। ঈমান হলো একটা বীজ। মানুষের মনে যখনই সে বীজ অংকুরিত হয় তখনই আপন স্বভাবের তাগিদে সে একটা বিশেষ ধরণের কর্মজীবনের গাছ জন্মাতে শুরু করে দেয়। সে গাছের কান্ড থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লবে ঐ বীজ থেকে নির্গত জীবনরসই সঞ্চারিত হয়। মাটিতে আমের আঁটি রোপন করলে তা থেকে লেবু গাছ হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মানুষের মনে আল্লাহ্‌র দাসত্বের বীজ বপণ করা হবে এবং তা থেকে চরিত্রহীনতা এবং কলুষিত বস্তুবাদী জীবন গড়ে ওঠবে, তা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত থেকে যে চরিত্রের উৎপত্তি হয়, সে চরিত্র আর শিরক এবং নাস্তিকতা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে যে চরিত্র গড়ে ওঠে তা সমান হতে পারেনা। মানবজীবন সংক্রান্ত এসব মতবাদের স্বভাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এর প্রতিটির প্রকৃতি অন্যটা থেকে ভিন্ন ধরণের চরিত্র দাবি করে।

সমগ্র জীবনের জন্যে আল্লাহপুরস্তির চরিত্র

আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে সৃষ্টি হয় যে চরিত্র, তা কোনো বিশেষ লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরং সমস্ত মানুষের জীবনে ও জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সে চরিত্রের প্রয়োগ বাঞ্চনীয়। একজন ব্যবসায়ী যদি আল্লাহভীরু হয়, তবে তার ব্যবসায়ে আল্লাহভীতি মূলক চরিত্রের প্রকাশ না ঘটার কোনো কারণ নেই। একজন বিচারক যদি আল্লাহভীরু হয়, তবে আদালতের বিচার কক্ষে এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে থানায় বা ফাঁড়িতে তার কাছ থেকে আল্লাহবিমুখ চরিত্র প্রকাশ হবে, এমনটি আশা করা যায়না। নগর জীবনে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এবং যুদ্ধ ও সন্ধিতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক চরিত্রের প্রকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। তা না হলে সে জাতির আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান থাকার কোনো অর্থ হয়না।

মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষা

এখন কথা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্র দাবি করে? আর মানুষের বাস্তব জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধ্যান ধারণায় সে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশই বা কিভাবে ঘটতে পারে, তা এমন এক ব্যাপক আলোচ্য বিষয়, যা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবে আমি নমুনা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বাণী এখানে উল্লেখ করছি। এ বাণীগুলো থেকে

বুঝা যাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন তাতে ঈমান, আমল ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যে কতো চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

০১. "ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ না মানা হলো এগুলোর মূল। আর তার ক্ষুদ্রতম শাখা হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। লজ্জাও ঈমানের একটি বিভাগ।"

০২. "(শরীর ও পোশাকের) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

০৩. "মুমিন সে ব্যক্তি যার থেকে মানুষের জান মাল নিরাপদ থাকে।"

০৪. "যার বিশ্বস্ততা নেই, তার ঈমান নেই এবং যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখেনা তার ধর্ম নেই।"

০৫. "যখন ভালো কাজে তোমার আনন্দ হবে এবং মন্দ কাজে হবে অনুশোচনা, তখন (বুঝবে) তুমি ঈমানদার।"

০৬. "ধৈর্য ও উদারতাকেই ঈমান বলা হয়।"

০৭. "সর্বোত্তম ঈমানদারি হলো, তোমার শত্রুতা ও মিত্রতা হবে আল্লাহ্র জন্যে, তোমার মুখে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হতে থাকবে এবং নিজের জন্যে যা পছন্দ করো অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করবে। আর নিজের জন্যে যা অপছন্দ করো অন্যের জন্যেও তা অপছন্দ করবে।"

০৮. "মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ঈমান হলো সে ব্যক্তির, যার স্বভাব চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যে আপন পরিবার পরিজনের সাথে সর্বাধিক ভালো ব্যবহার করে।"

০৯. "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত মেহমানের যত্ন করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। আর যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে যেনো ভালো কথা বলে, কিংবা চুপ থাকে।"

১০. "মুমিন কখনো অপবাদ ও অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও কটূভাষী হয়না।"

১১. "মুমিন কিছুতেই আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হতে পারেনা।"

১২. "আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয়! আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয়! আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয়! যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকেনা।"

১৩. "প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে নিজে পেট ভরে খায় সে মুমিন নয়।"

১৪. "ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তা সংবরণ করে, আল্লাহ তার মনকে ঈমান ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ করে দেন।"

১৫. "যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামায পড়ে সে শির্‌ক করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোযা রাখে সে শির্‌ক করে এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানো দান খয়রাত করে সেও শির্‌ক করে।"

১৬. "চারটি দোষ যার ভেতরে থাকে সে পুরোপুরি মুনাফিক : আমানতের খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভংগ করে এবং ঝগড়া করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

১৭. "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এতো বড় কবিরা গুনাহ্ যে তা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার কাছাকাছি।"

১৮. " যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে-ই হলো আসল মুজাহিদ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে সে-ই হলো আসল মুহাজির।"

১৯. "তোমরা কি জানো, কারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র ছায়ায় স্থান পাবে? শ্রোতারা বললো, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলই ভালো জানেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাদের সামনে সত্য পেশ করা হলে তা গ্রহণ করে, অধিকার দাবি করলে মুক্ত মনে তা দিয়ে দেয়, আর নিজেদের ব্যাপারে যেমন ফায়সালা তারা কামনা করে অন্যদের বেলায়ও তেমনি ফায়সালা করে।"

২০. "তোমরা আমাকে এই ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবোঃ কথা বললে সত্য বলবে, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে, তোমাদের কারো কাছে আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে, ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকবে, কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং যুলুম থেকে বিরত থাকবে।"

২১. "ধোকাবাজ, কৃপন এবং দান করে যে বলে বেড়ায়, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।"

২২. "হারাম খাদ্য থেকে তৈরি শরীর জান্নাতে যাবেনা। যে গোশ্‌ত হারাম খাদ্যের দ্বারা প্রতিপালিত তার জন্যে আগুন বা জাহান্নামই উপযোগী।"

২৩. "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করে এবং খরিদ্দারকে সে দোষের কথা জানিয়ে দেয়না, তার উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ থাকেন এবং ফেরেশ্‌তারা তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে।"

২৪. "কোনো ব্যক্তি যদি বার বার জীবন লাভ করে এবং বার বার আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, তবু সে জান্নাতে যেতে পারবেনা, যদি সে তার ঋণ পরিশোধ না করে।"

২৫. "পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক, জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করে কাটায়, কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলে যদি কারো হক নষ্ট করে অসিয়ত করে, তবে তার দোযখে যাওয়া অবধারিত।"

২৬. "অধীনস্তদের সাথে খারাপ আচরণকারীরা জান্নাতে যাবেনা।"

২৭. "রোযা, নামায ও দান খয়রাতের চেয়েও ভালো কাজ কি জানো? সেটা হলো পারস্পরিক বিরোধের নিস্পত্তি করে দেয়া। পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন মারাত্মক কাজ যে তার দ্বারা মানুষের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।"

২৮. "প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে কিয়ামতের দিন প্রচুর পরিমাণে নামায, রোযা ও যাকাত সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সেই সাথে কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কাউকে অপবাদ দিয়ে এসেছে, কারো অর্থ আত্মসাৎ করে এসেছে, কারো রক্তপাত করে এসেছে, কিংবা কাউকে প্রহার করে এসেছে। অতপর আল্লাহ তার সব নেকি ঐসব মযলুমদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। তারপরও ঋণ পরিশোধ না হলে তাদের গুনাহ তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।"

২৯. "যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানো জন্যে দ্রব্যসামগ্রী মজুদ করে সে অভিশপ্ত।"

৩০. "মূল্য বৃদ্ধির আশায় যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখে, তার সাথে আল্লাহ্র কোনো সম্পর্ক নেই।"

৩১. "খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন আটকে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু আটকে রাখার গুনাহ মাফ হবেনা।"

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বাণীর মধ্যে কয়েকটি এখানে পেশ করা হলো। এ থেকেই অনুমান করা যায়, তিনি ঈমানের সাথে চরিত্রের এবং চরিত্রের সাথে জীবনের সকল বিভাগের সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিহাসের প্রত্যেক পাঠকই জানেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী কেবল কথার কথাই ছিলনা, বরং বাস্তব জগতে একটি গোটা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি তারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এটাই তাঁর সেই বিরাট অবদান, যার জন্যে তিনি মানবজাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। #

সমাপ্ত